গঝ ডড়ৎফ ঊীঢ়ড়ৎঃ এড় গঁষঃরঢ়ষব চউঋ ঋরষবং ঝড়ভঃধিৎব - চষবধংব ঁৎপযধংব ষরপবহংব.

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির স্থগিত নির্বাচন ও দেশের ভবিষ্যত

অধ্যাপক মো. আনোয়ার হোসেন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির অফিসে সমিতির কার্যকর পরিষদের নির্বাচিত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের নামফলক রয়েছে। শিক্ষক সমিতির জন্মলগ্ন থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত এই নামফলকে একটি নির্দিষ্ট ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। সেটি হচ্ছে প্রতি বছরের জন্য নির্বাচিত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নাম বছরের ক্রম অনুযায়ী সাজানো আছে। নির্দিষ্ট সময়ে অর্থাৎ বছরের শেষ মাস ডিসেম্বরের কোন তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং নতুন বছরের একেবারে শুরুতে নতুন নেতৃত্ব দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে কখনও এর অন্যথা অথবা কোন জটিলতা, শান্তি ভঙ্গ বা অনিয়মের অভিযোগ উচ্চারিত হয়নি। সে কারণে দেশের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনের জন্য শিক্ষক সমিতির নির্বাচনকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করার কথা অনেকে বলেছেন। গণতন্ত্র চর্চার এই দীর্ঘ ধারাবাহিক ঐতিহ্যে একটি বড় প্রশ্নবোধক চিহ্ন ও ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় ২০০৭ সালে। নিয়ম ও ঐতিহ্য অনুযায়ী ঐ বছরের ডিসেম্বর মাসে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা। কিন্তু ডিসেম্বর মাসের ৩০ তারিখ এবং পরে ৩১ তারিখে সে নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হলেও তা অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। কারণ হিসেবে শিক্ষকমন্ডলী ও দেশবাসী জেনেছেন নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত একের পর এক শিক্ষক নির্বাচন পরিচালনায় তাদের অপারগতা জানিয়ে দায়িত্ব থেকে সরে দাড়িয়েছেন। এভাবে দায়িত্ব নিয়ে পরে অপারগতা প্রকাশের নজির ইতোপূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে আর দেখা যায়নি। কেন এমন হলো? যাঁরা অপারগতা প্রকাশ করেছেন, তাঁরা ব্যক্তিগত কারণ উল্লেখ করলেও তার পেছনের কথা সরাসরি প্রকাশ করেননি।

এরপর ২০০৮ সালের ১৫ জানুয়ারী নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হলেও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। দেশে মার্শাল'ল, জরুরী অবস্থা, দীর্ঘ সেনা শাসন এসেছে, কখনই শিক্ষক সমিতিকে সরকারী অনুমতি নিয়ে নির্বাচন করতে হয়নি। কিন্তু এবারে সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবং কার্যকর পরিষদের একজন শিক্ষককে কারাগারে অন্তরীণ করার পর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সময়কালে নির্বাচন অনুষ্ঠানের অনুমতি চেয়ে নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক বদরুন নাহারকে পুলিশ কমিশনার বরাবর পত্র এবং পরে তাগিদ পত্র দিতে হয়েছে। নির্বাচনের ঘোষিত তারিখ পেরিয়ে গেছে, নির্বাচন অনুষ্ঠানের অনুমতি আসেনি। এমতাবস্থায় নির্বাচন কমিশনার দায়িত্ব পালনে অপারগতা জানিয়েছেন। ২২ জানুয়ারি, ২০০৮ তারিখে কারাবন্দী শিক্ষকদের মুক্তির পর, কার্যকর পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে ৪ মার্চ নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হলেও পূর্বের মতোই দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাচন কমিশনার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেন। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২৭ মার্চ নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হয় এবং নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ডালেম চন্দ্র বর্মন নির্বাচনী তফশিল ঘোষণা করেন। নির্বাচনে দু'টি প্যানেল থেকে শিক্ষকগণের নমিনেশনপত্র জমা নেয়া, তা বাছাই এবং চূড়ান্ত নমিনেশন অনুযায়ী ব্যালটপত্র ছাপানোসহ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সকল আয়োজন চূড়ান্ত হয়ে গেলে ২৫ মার্চ মধ্যরাতের পর যৌথবাহিনীর একটি দল অধ্যাপক ডালেম চন্দ্র বর্মনের বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক এলাকায় অবস্থিত বাসায় প্রবেশ করে। তারা সেখানে এক ভীতিকর পরিবেশের সৃষ্টি করে এবং অধ্যাপক ডালেম চন্দ্র বর্মনকে নির্বাচন স্থগিত অথবা নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব থেকে সরে যেতে বলে। ইতোপূর্বে কয়েকজন নির্বাচন কমিশনার কেন ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়েছিলেন, তা একেবারে স্পষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু এবারে একটি ব্যতিক্রম ঘটে। ড. ডালেম চন্দ্র বর্মন মধ্যরাতের এই অভিযানের খবরটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও

শিক্ষক সমিতিকে অবহিত করেন এবং দায়িত্ব পালনে তিনি অপারগ হলেও যে নির্বাচন স্থগিত হবে না, নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাচন কমিশনার নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নেবেন, এই স্পষ্ট কথা যৌথ বাহিনীকে জানিয়ে দেন। এ অবস্থায় ২৭ মার্চ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাত্র ১৬ ঘন্টা আগে বিশেষ বাহকের মাধ্যমে ঢাকা মেট্রোপলিটান পুলিশ কমিশনারের পক্ষ থেকে নির্বাচন স্থগিত করে নতুন তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠানের অনুমতি চেয়ে নির্বাচন কমিশনারকে মেট্রোপলিটন পুলিশ বরাবরে পত্র প্রেরণের অনুরোধ জানানো হয়। এ প্রেক্ষিতে ২৭ মার্চ সমিতির পূর্ব ঘোষিত বাৎসরিক সাধারণ সভায় শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে নগ্ন সরকারী হস্ত ক্ষেপ ও গভীর রাতে শিক্ষকের বাসায় যৌথ বাহিনীর অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জানিয়ে এই হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয় যে, এরপর এ ধরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলে শিক্ষক সমিতি কঠোর আন্দোলনের কর্মসূচি দিতে বাধ্য হবে। একই সাথে সরকারের অনুরোধে সাড়া দিয়ে নির্বাচন স্থগিত করে ১২ এপ্রিল তারিখে তা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয় এবং তা অনুষ্ঠানের অনুমতি চেয়ে মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার বরাবরে পত্র প্রেরণ করেন নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ডালেম চন্দ্র বর্মন। উপাচার্য মহোদয়ও জানান যে, শিক্ষা উপদেষ্টা নির্বাচন অনুষ্ঠানে আর কোন বাধা আসবেনা বলে তাঁকে আশ্বস্ত করেছেন। শিক্ষকদের মনে আস্থা ও স্বস্তি ফিরে আসে এ কারণে যে, মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনার বরাবরে পত্র মারফত নির্বাচন অনুষ্ঠানের অনুমতি এবং সকল সহায়তা প্রদানের আশ্বাস প্রদান করা হয়।

এবারে নির্বাচন স্থগিত হয় ভিন্নভাবে। অবাক বিস্ময়ে শিক্ষকেরা জানতে পারেন ১২ এপ্রিল নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে জেলা জজ আদালতে একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের অনিয়মিত ছাত্র মো. আশিকুল ইসলামের দায়ের করা আর্জির পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, রেজিস্ট্রার, শিক্ষক সমিতির সভাপতি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব, মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনারকে বিবাদী করে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে। বিস্ময়ের কথা হলো উপাচার্য এবং রেজিস্ট্রার শিক্ষক সমিতির সাথে কোনভাবে সম্পর্কিত না হলেও তাদের বিবাদী করা হয়েছে। একই সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সমিতির মুখপত্র হওয়া সত্ত্বেও তাকে বিবাদী না করে বিবাদী করা হয় সমিতির সভাপতিকে। নিষেধাজ্ঞায় বলা হয় "রাষ্ট্র বা জনসাধারনের নিরাপত্তা বা স্বার্থ রক্ষার্থে বা জন-শৃংখলা ও শান্তি বজায় রাখিবার নিমিত্তে ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি, গণকর্মচারীদের রাজনীতি সম্পর্কিত কার্যক্রম ও সকল পেশাজীবী সংগঠনের তৎপরতা জরুরী অবস্থা ঘোষনার কার্যকারিতাকালে নিষিদ্ধ থাকিবে"। আরও বলা হয় নির্বাচন হলে ক্যাম্পাসে অভিযোগকারীসহ ছাত্রদের স্বাভাবিক শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হবে। তাই নির্বাচন অনুষ্ঠানে অন্তবর্তিকালীন নিষেধাজ্ঞা জারী না হলে অভিযোগকারী এবং সকলের জানমালের অপরিমেয় ক্ষতি সাধিত হবে। জরুরী অবস্থায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের উপর স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারী এবং পুলিশ কমিশনারকে নির্বাচন অনুষ্ঠানের অনুমতি প্রদানে বিরত রাখার অনুমতি প্রার্থনা করা হয়।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, শিক্ষক সমিতি কোন রাজনৈতিক সংগঠন নয় এবং ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাও নয়। শিক্ষক সমিতির নির্বাচন রাজনীতি সম্পর্কিত কোন কার্যক্রমও নয়। সর্বপোরি এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র বা জনসাধারনের নিরাপত্তা বা স্বার্থ অথবা জন-শৃংখলা ও শান্তি অতীতেও বিনষ্ট হয়নি, বর্তমানেও হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই।

বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক হওয়ার কারণে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সুরক্ষিত হওয়ার প্রত্যাশা সৃষ্টি হলেও নিতান্ত পরিতাপের বিষয়, একজন ছাত্রের হাস্যকর অভিযোগের প্রেক্ষিতে ঐতিহ্যবাহী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি নির্বাচনের উপর স্থগিতাদেশ আসে। এপ্রিল মাসে আসা স্থগিতাদেশের আদেশের বিরুদ্ধে শুনানীর তারিখ ধার্য হয় দীর্ঘ দুমাস পর

১৬ জুন তারিখে। সে তারিখে বাদী পক্ষের সময় প্রার্থনায় সায় দিয়ে বিজ্ঞ জজ আগামী ৯ জুলাই শুনানীর দিন ধার্য করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাচন স্থগিত করার রাষ্ট্রীয় এবং বিচারিক আদেশের বর্ণনা একটু দীর্ঘ হলেও দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গিকার নিয়ে ১১ জানুয়ারি ২০০৭ সালে ক্ষমতাগ্রহণকারী সেনা-নিয়ন্ত্রিত বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে নাগরিকদের ন্যূনতম গণতন্ত্র চর্চায় সরকার ও রাষ্ট্রের নগ্ন হস্তক্ষেপের স্বরূপ প্রকাশে তা প্রয়োজন ছিল।

নির্বাচন বন্ধ করে দেয়ার নানামুখী তৎপরতার প্রেক্ষাপটে কয়েকটি বিষয় বিবেচনার দাবী রাখে। দেশের ব্যবসায়ীদের প্রতিষ্ঠান এফবিসিসিআই-এর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পেরেছে যেখানে প্রার্থীগণ নির্বাচনী প্রচারণা পর্যন্ত চালাতে পেরেছেন। সুপ্রিমকোর্ট আইনজীবী সমিতির নির্বাচন আন্দোলনের মুখে অনুষ্ঠিত হতে দিতে সরকার বাধ্য হয়েছে। এরপর ঢাকা আইনজীবী সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। অতি সম্প্রতি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠান হয়েছে। সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাচন বন্ধ। এর কারণ কী? আরও গুরুতর প্রশ্ন। নির্বাচন বন্ধে যৌথ বাহিনীর মধ্যরাতের অভিযানের পর সরকারী অনুরোধে শিক্ষক সমিতি কর্তৃক নির্বাচনের নতুন তারিখ ঘোষণা এবং তা অনুষ্ঠানের সরকারী অনুমতি লাভের পরও একটি বিশেষ সংস্থার হস্তক্ষেপে ছাত্র কর্তৃক মামলা দায়ের, তা আমলে নেয়া এবং দীর্ঘ ৩ মাসের মধ্যেও তা নিঃষ্পত্তি না করার মধ্য দিয়ে নাগরিকদের ন্যূনতম মৌলিক অধিকার রক্ষায় স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা কতটুকু ভূমিকা রাখবে?

এ প্রশ্নও স্বাভাবিকভাবে জনমনে দেখা দেবে যেখানে শিক্ষক সমিতির একটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকার ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান যেমন সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার এত আপত্তি সেখানে দেশে নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় বহু ঘোষিত জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের ভবিষ্যত কী ? সে ভবিষ্যত যে এখনও অতল অন্ধকারে তা সরকার, নির্বাচন কমিশন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, গোয়েন্দা সংস্থার একের পর এক তৎপরতা থেকে বড়ই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাই দেখা যায় বর্তমান সেনা-নিয়ন্ত্রিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতাগ্রহণের দীর্ঘ দেড় বৎসর পর সারাদেশে অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত ঘরোয়া রাজনীতি শুরু হওয়ার পরপরই নজীরবিহীনভাবে রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের গণগ্রেপ্তার, নির্বাচনের পূর্বেই জাতীয় সনদ তৈরী বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার ঘোষণা, সংবিধান সংশোধন, নির্বাচনী এলাকার সীমানা পূনঃনির্ধারণ, প্রায় সকল রাজনৈতিক দলের বিরোধিতার পরও জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের তোড়জোড় শুরু হয়েছে।

বিএনপি-জামাত জোট সরকারের নীল-নকশার নির্বাচনকে প্রতিহত করার জন্য বিরোধী মহাজোটের প্রচন্ড আন্দোলনের মুখে ১১ জানুয়ারী জোটের বশংবদ রাষ্ট্রপতি ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদের তথাকথিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে হটিয়ে রাষ্ট্রপতিকে দিয়েই নিজ সরকারের ব্যর্থতার ইতিহাস জাতির উদ্দেশ্যে প্রচার; কালো টাকা, পেশী-শক্তি মুক্ত একটি স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নির্বাচিত বেসামরিক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং দূর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযানের ঘোষনায় নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি যে বিপুল জনসমর্থন সৃষ্টি হয়েছিল তা ক্ষমতা গ্রহণের ৬ মাসের মধ্যে কমতে শুরু করে বর্তমানে শুন্যের কোটায় পৌঁছে গেছে। এর কারণ হিসেবে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো উল্লেখ করা যায়ঃ

১। দেশে দ্বৈত শাসন চলছে; একটি বেসামরিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার অপরটি সেনা গোয়েন্দা সরকার। দ্বিতীয় সরকারটি অদৃশ্য, ভুতুড়ে। সরকার, নির্বাচন কমিশন, দুদক এবং বিচার ব্যবস্থাসহ রাষ্ট্র ও সমাজের সকল ক্ষেত্রে এই ভুতুড়ে সরকারের নগ্ন

হস্তক্ষেপের কারণে রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনায় ভয়াবহ সমন্বয়হীনতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে অস্বচ্ছতা ও দোদুল্যমানতা এবং সরকার পরিচালনায় সীমাহীন অদক্ষতা দেশকে ধ্বংসের প্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে। আশাহত ও ক্ষুব্ধ মানুষের প্রতিবাদ ও আন্দোলনের ভয়ে তাই ভুতুড়ে সরকার-নির্দেশিত গণ গ্রেপ্তার অভিযান চালাতে হচ্ছে।

২। *দেশে গত দেড় বছরে হরতাল, কর্ম-বিরতি, আন্দোলন না হলেও এবং চাল, গম, আলুর বাম্পার ফলন হওয়া সত্বেও দ্রব্যমূল্যের অগ্নিমূল্য এবং তার পেছনে কথিত সিন্ডিকেটকে ভেঙ্গে ফেলতে ব্যর্থ হওয়ায় সরকারের দক্ষতা ও যোগ্যতা বিষয়ে মানুষের আর কোন আস্থা নেই।*

৩। *২০০৮ সালের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান বিষয়ে সরকার, নির্বাচন কমিশন, সেনা প্রধান এবং ক্ষমতাধর বিদেশী কুটনৈতিক প্রতিনিধিদের অব্যাহত ঘোষণা ও আশ্বাসের পরও জনগন বিশ্বাস করতে পারছে না যে দেশে ঘোষিত সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং নির্বাচিত বেসামরিক সরকারের হাতে ভুতুড়ে সেনা গোয়েন্দা সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করবে।*

৪। *দুর্নীতি-বিরোধী অভিযান যে নিতান্তই একটি চমক এবং প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক শক্তিকে ঘায়েল করার কৌশল তা দেশের জনগণ বুঝে গেছে। এই অভিযান নাগরিকদের প্রতিদিনকার জীবনে কোন সুফলই বয়ে আনেনি বরং ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানাসহ সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সৃষ্টি করছে মহাধ্বসের। সে কথার সত্যতা মিলেছে সম্প্রতি প্রকাশিত ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল অব বাংলাদেশের দুর্নীতি সংক্রান্ত রিপোর্টে। সেখানে বলা হয়েছে বর্তমান সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান পরিচালনা করলেও দেশে দুর্নীতি কমার বদলে তা বেড়ে গেছে। তারেক জিয়ার নেতৃত্বে হাওয়া ভবনের দুর্নীতির এত খবর প্রকাশের পরও চিকিৎসার নামে তাকে বিদেশে পাঠাবার রহস্যময় তৎপরতায় দুর্নীতি বিরোধী অভিযান যে বাংলাদেশের পূর্ববর্তি সামরিক শাসনামলের মত আরও একটি চক্ষুলজ্জাহীন চমক, তাতে আর সন্দেহ কী। এই ছোট দেশে ঘন-বসতিপূর্ণ মানুষের নানা সম্পর্কের জালে কোন গোপন তথ্য গোপন থাকে না। যা আশংকা করা গিয়েছিল - দীর্ঘদিন সেনা শাসন চললে সেনাবাহিনী দুর্নীতিতে লিপ্ত হবে - তাই সত্য হয়ে দেখা দিচ্ছে বলে মানুষজন বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। সেনাচালিত সরকারের শাসনকালে বিলাসবহুল গাড়ী, ফ্লাট ও জমির মালিক কারা হচ্ছে এবং স্টক এক্সচেঞ্জে বিনিয়োগ মুখ্যত কারা করছে - এসব তথ্যের খোঁজ করলে বিষয়টি একেবারে স্পষ্ট হয়ে যাবে।*

৫। *যুদ্ধপরাধী জামায়েত চক্রের প্রতি সেনা গোয়েন্দা ভুতুড়ে সরকারের নির্লজ্জ পক্ষপাতিত্ব খুবই স্পষ্টভাবে মানুষের চোখে ধরা পড়েছে। একেবারে শেষ সময়ে এসে নিজামির গ্রেপ্তার নাটক যে দেশে অবশ্যম্ভাবী গণআন্দোলনে জামায়েতে ইসলামকে বিএনপির সহযোগী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই নেয়া হয়েছে তা সচেতন নাগরিকেরা বুঝতে পারছেন। জামায়েতে ইসলামের বিরুদ্ধে দেশবাসী এত সোচ্চার হওয়ার পরও এবং বিগম খালেদা জিয়া ও বিএনপি'র দুর্দিনে তাদের কোন সাহায্যে জামায়েত না আসার পরও বর্তমানে খালেদাপন্থী বিএনপি এবং জামায়েতের ঐক্য আরও দৃঢ়বদ্ধ হয়েছে। এই অশুভ ঐক্য বিএনপি সমর্থক জনগণকে শুধু নয়, খোদ বিএনপিতে মুক্তিযুদ্ধ এবং গণতন্ত্রের প্রতি আস্থাশীল নেতা-কর্মীদের ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ করেছে।*

৬। নির্বাচন কমিশনে এমন ব্যক্তিদের বসানো হয়েছে, যারা সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার নির্দেশে কাজ করেন। একটি নীল নকশার নির্বাচন বাস্তবায়নের পক্ষে প্রথম থেকেই সুপরিকল্পিত ভাবে সেনা-গোয়েন্দা সংস্থাটি কাজ করে যাচ্ছে। সারা দেশে প্রার্থী বাছাই, যোগ্য প্রার্থী তাদের আজ্ঞাবহ না হলে গ্রেপ্তার ও মামলা দিয়ে নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা, নির্বাচনী এলাকার সীমানা পূনঃনির্ধারণ, ইউনিয়ন-উপজেলা চেয়ারম্যানদের দিয়ে কমিটি গঠন করে স্থানীয় নির্বাচনের দাবী, তথাকথিত কিংস পার্টি গঠন - এ সবই করছে তারা।

আশার কথা যে, নিজেদের চরম অযোগ্যতা এবং সচেতন দেশবাসীর নিঃশব্দ কিন্তু দৃঢ় বিরোধিতার মুখে সেনা গোয়েন্দাদের কোন অপঃতৎপরতা এখনও পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি। তবে তাদের গণবিরোধী ও সেনা প্রতিষ্ঠান-বিরোধী তৎপরতায় ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে দেশ, প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ছে গোটা সেনাবাহিনী।

৭। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা যিনি বিএনপি-জামাত জোটের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে মহাজোটকে নেতৃত্ব দিয়েছেন, রাজনীতিবিদদের মধ্যে একমাত্র যিনি সাহস করে সত্য উচ্চারণ করেছেন; সেনা-গোয়েন্দা সংস্থার অপতৎপরতার বিরূদ্ধে বলেছেন, গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে নির্বাচন চেয়েছেন - অত্যন্ত পক্ষপাতমূলক ভাবে তাঁকে প্রথমেই গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে একের পর এক মামলার কাজ দ্রুতগতিতে চালায় ভুতুড়ে সরকার। নিরপেক্ষতা দেখানোর জন্য পরে বেগম খালেদা জিয়া ও আরও পরে নিজামী-কে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত খালেদা জিয়া ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে অথবা জামায়েত নেতাদের বড় বড় দূর্নীতির বিরুদ্ধে তেমন কোন মামলার কাজ শুরু হয়নি। তারেক জিয়ার বিরুদ্ধেতো এখনও পর্যন্ত কোন মামলার চার্জ গঠন করা হয়নি। সব মামলা হাইকোর্টে গিয়ে থেমে যাচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টও বড় সদয় তার ব্যাপারে। আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভায় সারাদেশের তৃণমূল পর্যায়ের নেতাকর্মীদের পক্ষ থেকে শেখ হাসিনার নিঃশর্ত মুক্তির বলিষ্ঠ আওয়াজের মুখে সংস্কারবাদী নেতাদের পিছু হটা এবং দেশে আশু আন্দোলনের ভয়ে শেখ হাসিনাকে মুক্তি দিয়ে চিকিৎসার জন্য বিদেশে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। বেগম খালেদা জিয়াকেও একই ভাবে মুক্তি দেয়া উচিত। শেখ হাসিনা এবং বেগম খালেদা জিয়ার ন্যায়বিচার পাওয়া এবং বিদ্যমান অচলাবস্থা নিরসনে এই দুই নেত্রীকে জামিনে মুক্তি দেয়া একটি অবশ্যম্ভাবী বাস্তবতা। কিন্তু দেশের সমূহ বিপর্যয়ের জন্য দায়ী তারেক জিয়াকে একই পাল্লায় মেপে চিকিৎসার নামে কারামুক্ত করার প্রচেষ্টা কেন? বেগম খালেদা জিয়াই বা কেন তার মুক্তির জন্য অনমনীয়? বরং তিনি যদি পুত্রস্নেহে অন্ধ না হয়ে চরম দুর্নীতিগ্রস্থ তারেক জিয়াকে তার দুঃস্কর্মের পরিণতি ভোগের ব্যাপারে কঠোর থাকতেন হবে তা সাদরে গৃহিত হত। দুই নেত্রীকে নিয়ে ভুতুড়ে সরকারের নানা নাটক তাঁদের ন্যায্য বিচার পাওয়া প্রশ্নে গভীর সন্দেহের সৃষ্টি করেছে। দেশের শীর্ষ দুই দলের দুই নেত্রী প্রশ্নে ভুতুড়ে সরকার কি ভাবছে তা বড় কথা নয়, দেশের মানুষের ভাবনা তাদের সম্পর্কে কী - তাই মূল কথা। এক্ষেত্রেও জনগণ ও সরকারের ভাবনা বিপরীত মেরুতে।

উপরের এই বাস্তব অবস্থায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বোধদয় হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠানের মত মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহ আর কোনভাবেই খর্ব না করে সরকারের একমাত্র লক্ষ্য হবে দ্রুততম সময়ে দেশে একটি অবাধ, স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান করে নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। এরজন্য এ বছরের ডিসেম্বরে নয়, আগামী অক্টোবর মাসেই নির্বাচন অনুষ্ঠানের সুনির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা করা যথাযথ হবে। জনগন এবং রাজনৈতিক দলগুলো যাতে মুক্ত পরিবেশে নির্বাচনী কর্মকান্ডে অংশ নিতে পারে, তারজন্য অবিলম্বে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করা প্রয়োজন হবে। মনে রাখতে হবে ভুতুড়ে সরকারের নীল-নকশার নির্বাচন ও রাবার স্টাম্প পার্লামেন্ট জনগণ মেনে নেবে না।

গত দেড় বছরে ভুল ও ভয়ের শাসনে দেশের এই নাজুক অবস্থায় ইতিহাস থেকে এবং সাম্প্রতিক সময়ে পাকিস্তানের সামরিক শাসনের পরিণতি থেকে ভুতুড়ে সরকারকে শিক্ষা নিতে হবে। পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক সরকারকে হটিয়ে অবৈধভাবে ক্ষমতা গ্রহণকারী সামরিক শাসক জেনারেল পারভেজ মোশাররফকে মার্কিন নীতি অনুসরণে ক্ষমতায় রাখতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১০ বিলিয়ন ডলার খরচ করেছে। আমাদের সেনানায়কদের পক্ষে তাদের কাছ থেকে ১ বিলিয়ন ডলার আনা সম্ভব হবে কিনা তাই সন্দেহ। যেখানে পারভেজ মোশাররফকে হয় অভিশংসন অথবা পদত্যাগ- এই দু'টোর মধ্যে একটি বেছে নিতে হচ্ছে, সেখানে আমাদের দেশের সেনা নায়কদের ভাগ্য কি হতে পারে? তাই অতীত ও নিকট সময়ের ইতিহাস পাঠ করে সেনা-চালিত ভুতুড়ে সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আরও কথা হলো বাংলাদেশের অতীত সামরিক শাসক জেনারেল জিয়া বা জেনারেল এরশাদের মত বর্তমানের সেনানায়কেরা রাষ্ট্রক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে গত দেড় বছরে নিজস্ব দল গঠন করতে পারেননি। ড. ইউনুস, ড. কামাল হোসেন, ড. ফেরদৌস কোরেশীকে বা বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের সংস্কারপন্থী নেতাদের দিয়ে পছন্দমত নতুন দল বা জোট গঠনে তারা সম্পূর্ন ব্যর্থ হয়েছেন। তাই সর্বক্ষেত্রে ব্যর্থ সেনা-চালিত সরকারের দ্রুত বিদায় এবং একটি নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের ক্ষমতাগ্রহণই কেবল বর্তমান অচলাবস্থার নিরসন করতে পারে। শেখ হাসিনার মুক্তির পর বেগম খালেদা জিয়াকে অবিলম্বে মুক্তি দিয়ে উভয় নেত্রী এবং রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আগামী অক্টোবর মাসে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিন-ক্ষন, নির্বাচনী আচরণবিধি - ইত্যাদি বিষয়ে অর্থবহ আলোচনাই এখন বর্তমান সরকারের একমাত্র কর্তব্য হবে। দেশের সমূহ সর্বনাশের জন্য দায়ীদের আপোষহীন নেত্রী ও নেতা বানাবার ভুতুড়ে সরকারের অপচেষ্টা পরিস্থিতিকে শুধু ঘোলাটেই করবে, জনগন নিস্কৃতি পাবে না। ষড়যন্ত্রের রাজনীতি দীর্ঘায়িত হবে। বেসামরিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার সেই অপবাদ ও দায়-দায়িত্ব কেন নেবেন?